Balmiki – Interview - Art – Nijer Sange Kathopokathan – Somnath Hor
বাল্মীকি - নিজের সঙ্গে কথোপকথন - সোমনাথ হোড়

কেন আঁকি
- ভিতরের অর্থাৎ শিল্পীসত্তার তাগিদে।
তাগিদ কেন ?
- শিল্পী আঁকার ক্ষমতা পেয়েছে। সেই ক্ষমতা অহরহ তাকে নব নব উদ্ভাবনে প্রাণিত করে। শিল্পীর নানা তাগিদ থাকতে পারে। পার্থিব কারণ অর্থাৎ জীবনজীবিকার প্রয়োজন মেটানো - যথা, যশ - অর্থ; ধর্মীয় অনুশাসনের প্রয়োজনে, রাষ্ট্র নীতি সমাজনীতির অঙ্গ হিসাবে। আধুনিক কালে যেমন ভ্যান গগ, সেজান, রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী, রবীন্দ্রনাথ এবং নতুন প্রজন্মের অনেকে শিল্পকলায় আপনাপন পথে রস অন্বেষণ এবং অপূর্ণলব্ধ উদ্‌ভাবনার তাগিদ অনুভব করেন। নব অন্বেষার এই তাগিদ একজন শিল্পীর দেহমন গভীরভাবে আপ্লুত করে।
কী আঁকি
-সত্তার প্রকাশ - আমার কাছে যা 'ক্ষত' রূপে চিহ্নিত। এতে সমাজসচেতনতা কতটা কাজ করে
আঁকার সময় আমি যে সম্পর্কে থাকি না। মাধ্যম এবং প্রকরণ আমাকে প্রত্যয়ের (কন্‌সেপ্ট্) জগতে নিয়ে যায়। এই কন্‌সেপ্ট্ সমাজজীবনেরই দীর্ঘ সময়ের এক বিশেষ ধরনের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত।

দর্শকের কাছে প্রত্যাশা কী
- দর্শকসংখ্যা খুবই সীমিত। তাঁদের কারো ভাল লাগলে ভাল; না লাগলে নালিশ নেই। যাঁদের ভাল লাগে আমার মর্মতারে তার ধ্বনি লাগলে সুখী হই। অন্যথায় নীরবতা।

শিল্পে নান্দনিকতা কী
-যা শিল্পকর্মে একধরনের মহিমা আরোপিত করে। সদানিযুক্ত চর্চার মধ্য দিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। শিল্পী এবং দর্শক উভয়কে এই চর্চার অংশীদার হতে হয়

রসের উৎস কী
- রসের কোনো ব্যাখ্যা নেই। রস শিল্পকর্মে অনন্য মহিমা আরোপ করে। যাঁর অন্তরে রস আছে তিনি মহৎ শিল্পকর্মে, সংগীতে সাহিত্যে বিস্ময়ের সন্ধান পান। সে বিস্ময়ের মূল কথা - বাখ্যাতীত ক্ষমতার বিকীরণ অর্থাৎ কী করে এমনটি হল! সংগীতের ক্ষেত্রে ভাষা না জানা সত্ত্বেও শারীরিক প্রক্রিয়ায় রোম খাড়া হয়ে যায়, অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেহমন এক অতীন্দ্রিয় স্তরে পৌঁছে যায়।

রুচি এবং রসগ্রাহিতায় প্রভেদ কী
- রুচি অনুশীলনে পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত হয়। কিন্তু রসগ্রাহিতা জন্মগত ক্ষমতা। অশিক্ষিতেরও অসাধারণ রসানুভূতি থাকতে পারে। অতি শিক্ষিত ব্যক্তিও বে - রসিক হতে পারেন।

শিল্পকলায় প্রাণশক্তি (tensi) কী
-এটি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। শায়িত একটি মৃতদেহ এবং ঘুমন্ত দেহের যে প্রভেদ - তাতে প্রাণশক্তি সূচিত হয়। পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে দর্শক যখন মূর্তির শ্বাসপ্রশ্বাসের স্পন্দন অনুভব করেন - তখন সমগ্র পরিবেশ প্রাণশক্তির প্রকাশে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মোহনজোদারোর ক্ষুদ্র নর্তকী এবং নরমূর্তিতেও এই শক্তি বিচ্ছুরিত। এলিফ্যান্ট, উলোরা, কোনারকেও - এই প্রাণপ্রাচুর্য দুর্বার প্রকাশিত।

মৌলিকতার লক্ষণ কী ?
সম্পূর্ণ মৌলিক কিছু হয় না। পরম্পরা - দেশজ কিংবা বহির্দেশীয় - অপ্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। চিত্রকলা চোখের জগতের বিস্ময়ন। Intuit বা স্বজ্ঞা শিল্পীকে নূতন আঙ্গিক সৃষ্টিতে উদ্যোগী করে তোলে। এই আঙ্গিকে নিজস্ব আকার, ছন্দ বিন্যস্ত হয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয় অ-ভূতপূর্ব প্রত্যয়, প্রবাহ এবং বিন্যাসচেতনা। এ সবের সঙ্গে প্রতিভার যোগে মহৎ শিল্পকর্মের সূচনা হয়। মহৎ শিল্পকর্মমাত্রই মৌলিক।

রাজনীতি এবং শিল্পকলার পারস্পরিক অবস্থান কী হতে পারে
-রাজনীতি যখন দলীয় রাজনীতি হয়ে দাঁড়ায়, প্রকৃত শিল্পকলা তার বাহন হতে পারে না। সমাজসচেতনতা অবশ্যই শিল্পকলায় প্রতিফলিত হতে পারে, তবে সেটা গৌণ। আপন অভিজ্ঞতায় দেখেছি - ক্ষেত্রবিশেষে রাজনীতির বিমূর্ততা অর্থাৎ দুর্বোধ্যতা শিল্পের বিমূর্ততাকে ছাড়িয়ে যায়। বিমূর্ত শিল্পকলা সমাজের ক্ষতি করে না; রাজনৈতিক দুর্বোধ্যতা যা কোটি কোটি জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, তা সমাজের সমূহ ক্ষতি করতে পারে। বর্তমান কালে চারদিকে এত প্রমাণ বিরাজমান যে, উদাহরণের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সাম্যবাদ এবং শিল্পকলায় কোন যোগসূত্র আছে কী
-সাম্যবাদ মনীষায় অর্জিত চেতনা, শিল্পকলা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বিশেষ ক্ষমতা। সাম্যবাদ শিল্পীকে শিল্পরচনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু শিল্পী তৈরি করতে পারে না।

আমি কাজ করি প্রধানত একটি মাত্র কন্‌সেপ্ট-এ, একে আমি ক্ষত বলি। দর্শক যদি শুধু বিষয়মনস্কতার সন্ধান পান, নান্দনিকতার অভাব দৃষ্ট হয়, তবে মনে হয় সবটাই ব্যর্থ। ভাবীকাল তাকে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করবে। কারণ আজকের জীবনযন্ত্রণা কাল বদলে যাবে, কিন্তু শিল্পীর নান্দনিক প্রকাশ অব্যাহত চলবে। আলতামিরা গুহার বাইসন, মিশরের গ্রীসের অপূর্ব শিল্পকলা, ইয়োরোপে রেনেসঁস, আধুনিক চিত্রভাস্কর্য, আমাদের মোহেনজোদারো, অজন্তা, ইলোরা, কোনারকের মন্দির ভাস্কর্য ইত্যাদির পেছনে সমাজচেতনা বহুক্ষেত্রেই কাজ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্পী যখন কোনো উৎকৃষ্ট কাজ করেছেন, প্রতিভার জোরেই সেটা করেছেন; বিষয়নির্ভরতার কারণে নয়।

কালীঘাটের পটুয়া সামাজিক বিষয় নিয়ে কাজ করেছে। তার সমাদর কিন্তু চিত্রকল্পের কারণে, অসাধারণ ক্ষেত্রবিন্যাস, তুলির অনায়াস বিচরণ, রঙের উল্লসিত প্রলেপ, সূক্ষ্ম অথচ নয়নবিমোহন ছায়া এবং তীব্র আবেগপূর্ণ সংযত রেখাঙ্গনে। রামকিঙ্কর বলতেন, যে দেশ শিবলিঙ্গের কল্পনা করেছে - তার শিল্পনান্দনিকতার উৎকর্ষ সম্পর্কে সংশয়ের কারণ নেই। সমাজচেতনা কথাটিকে যদি রবারের ফিতের মতো টেনে প্রসারিত করি, তাতে স্থিরচিত্র (ফুলদানি, ফলদানি) থেকে শুম্ভ - নিশুম্ভের লড়াই পর্যন্ত সবেরই ব্যাখ্যা পাওয়াযাবে। যাঁরা ক্ষমতাধারী হয়ে তাঁদের রাজনৈতিক মতামতের (মতবাদও নয়) বিষয়ে শিল্পকর্মের চাহিদা বিবৃত করেন, তাঁরা অধিকাংশক্ষেত্রেই পোস্টার কিংবা সচিত্রকরণ চান, প্রকৃত শিল্পকর্মের ধ্যানধারণাকে উপলব্ধি করেন না। নিজে ভুক্তভোগী বলে এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস পেয়েছি। কতটা সার্থক, ভাবীকালই তার বিচার করবে। রামকিঙ্করের মতো 'সমাজ

সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব' বলে নন্দলালের মতো শিল্পীর বুকে কাঁপন ধরিয়ে না পারলাম মাটির তাল ছুঁড়তে, না পারলাম তুলির ডগায় সুরের ঝংকার তুলতে, প্রতিভার তারতম্যে এমন তো হবেই।

আজকাল প্রদর্শনী করার আমার আগ্রহ কমে গেছে। অনেকেই কারণ জানতে চান। আসলে প্রদর্শনী অনেকটা শহরকেন্দ্রিক, কয়েকশত কিংবা হাজার কয়েক লোক প্রদর্শনী দেখেন। খবরের কাগজে লেখালেখি হলে সেই সংখ্যা বাড়ে কিংবা কমে। বলা বাহুল্য সংবাদপত্রে ভাষ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেয়ালে চলে। কলকাতার মতো শহর যেখানে লোকসংখ্যা আশি থেকে একশ লক্ষ, সেখানে হাজার লোকের চিত্রনিদর্শন সংস্কৃতিক্ষেত্রে কতটা রেখাপাত করবে?' একটি চলচ্চিত্র একই সঙ্গে দেশের লক্ষ লোকের দৃষ্টিগোচর হতে পারে। দীর্ঘ সময় চললে কিংবা দূরদর্শনে দেখানো হলে কোটি কোটি লোক তা দেখতে পারে। ললিতকলায় এটা কখনোই সম্ভব নয়, কাজেই জনসাধারণের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশের জন্য কাজ নিয়ে যত্রতত্র ছুটোছুটি করতে আর ভাল লাগে না। আমি এখন কাজ করি প্রধানত পেশা খানিকটা নেশার মতো হয়ে গেছে বলে। কিছু বন্ধুবান্ধব ভালবেসে কাজ সংগ্রহ করে যা দক্ষিণা দেন, তাতেই আমাদের আর্থিক প্রয়োজন মিটে যায়। 'কাল'-ই যেখানে শিল্পকর্মের মান এবং স্থান নির্ধারক, শিল্পবিচার তার হাতে ছেড়ে দেওয়াই বিধেয় বলেমনে হয়

তবে কেন এই প্রদর্শণী? অনেকবার পিছিয়ে আসার কথা ভেবেছি। কিন্তু এমন কিছু ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা কিছুটা দুর্বল করে দেয়। সীগাল -এর নবীন কিশোর তেমনই একজন। তাঁর নিজের ভালো লাগাটাকে অন্যের ভালো লাগায় পরিণত করতে চান। আমার কেবলই মনে হয় - এ তো সাময়িক। কালজয়ী কাজ যাঁরা করেছেন - তাঁদের ধারে কাছে যাবার যোগ্যতা অর্জন আমার হল কই! আমার সৌভাগ্য এই, জন্মসূত্রে আঁকিবুকির জগতে প্রবেশাধিকার পেয়ে তাঁদেরই মতো আনন্দের কিছুটা ভাগ পেলাম। পাখির গানের মতো - কোনটা কোয়েল কোনটা দোয়েল, মৌটুসি, বুলবুল - গানের আবেগ যখন আসে, গানেই তাদের সব আনন্দ। শিল্পকর্মে আনন্দের স্থান এত মৌল যে পার্থিব জীবনের শ্রম, হতাশা, ব্যর্থতা নির্মম দারিদ্র্য - কোন কিছুই ভ্যান গগের সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করতে পারেনি। আমরা তাঁদেরই মতো আনন্দপূজারীদের উত্তরসূরী, তাঁদের বিচ্ছুরিত আলোয় উত্তাপ গ্রহণ করে ধন্য।

দুটি আপাত অসংলগ্ন কথা বলে কাহিনী থামাই। সাঁতার পুকুরের ধারে বিনোদ - দার কাছাকাছি যখন থাকতাম, মাঝে মাঝে সন্ধ্যে সাড়ে সাত - আটটা নাগাদ তাঁর কাছে যেতাম। গল্প করতে করতে হঠাৎ বলে উঠতেন- 'সোমনাথ, চা খাবে! আমি একটু চা খাব।' তখন ওঁর কাজের মেয়ে জীবনী কাজ সেরে চলে গেছে। আমি বললাম, 'আপনি বসুন, আমি জল বসিয়ে দিচ্ছ।' উনি বলতেন - 'দেখোই না, আমি কেমন চা করে নিচ্ছি; তবে দুধ চিনি ছাড়া।' লাঠি নিয়ে চায়ের জায়গায় গিয়ে ইলেকট্রিক কেট্‌লিতে জল ভরে নিয়ে সুইচ টিপতেন; কয়েক মিনিটের মধ্যে জল ফুটলে, বড় দুটি চীনে মাটির চা বাড়িয়ে আমরা বসে যেতাম) নানা বিষয়ে গল্প জমত। অন্ধত্বকে কখনোই উনি পেয়ে বসার সুযোগ দেননি। প্রায় সেই সময় ৭` x ৬০` ফুট বর্গক্ষেত্রে তাঁর অভিনব দেয়ালচিত্র সৃজনে এই অদম্যতার স্বাক্ষর বর্তমান।

১৯৬৮ কি ৬৯ সালে কিঙ্করদা যখন কঠিন রোগভোগের পর কলকাতা থেকে ফিরে এলেন, রেবা মাঝে মাঝে কিছু মাছ কিংবা মাংসরান্না করে ওঁর রতনপল্লীর বাড়িতে নিয়ে যেতেন। উনি খুবই কম খেতেন, তবু কেউ করে নিয়ে গেলে খুশি হতেন। খাওয়ার সময় দেখতাম কয়েকটি বেড়াল এবং কুকুর ছানা সরাসরি পাত থেকে খাচ্ছে, আর উনি সাদরে বলছেন, 'খা, খা, বাঁচতে হবে তো!' কী বিরাট এবং ভরাট হৃদয়!

দুজনেই শান্তিনিকেতনকে ভালোবাসতেন। বিনোদ - দা শেষজীবনে কয়েকবারই দিল্লি থেকে ফিরে আসার কথা ভেবেছেন; কিন্তু আর্থিক এবং বার্ধক্যের কারণে শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। কিঙ্করদা কলকাতায় হাসপাতালে যখন শেষবারের মতো চিকিৎসাধীন, কেবলই বলেছেন - 'সোমনাথ, আমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে চল, আমার কিছু হয়নি। মরতে হয়, আমি ওখানেই মরব।'

এখানে থাকতে দুজনেই নানাভাবে দুঃখ পেয়েছেন; কিন্তু সে তো জীবনেরই অঙ্গ। দুঃখ পাই বলে জীবনের মর্ম উদ্‌ঘাটিত হয়, আনন্দ পূর্ণতা পায়।

Balmiki – Prabandho – Art – Gopal Sanayal - Sandip Sarkar

বাল্মীকি - গোপাল সান্যাল - সন্দীপ সরকার

গোপাল সান্যালের ছবির আবেদনে সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞ উভয় শ্রেণীর দর্শকই মুগ্ধ হন। উ ভয় শ্রেণীর দর্শককে তৃপ্ত করার দুর্লভক্ষমতা সব শিল্পীর থাকে না।

তিনি তৈলচিত্র আঁকলেও ইউরোপের অনুরকণ করেননি। হয়তো তার আঙ্গিক, রূপারোপ, বর্ণলেপন, এবং পটভূমি বিভাজনের মধ্যে ইউরোপীয় নানা শৈলীর প্রভাব দেখা গেছে, কিন্তু তাঁর মানুষজন, পশু, পাখি, গাছপালা, সবই ক্রান্তিয় বলয়ের সূর্যের গন্ধমাখা। তাদের শোয়া - বসার ভঙ্গি, চলাফেরার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার জীবনদর্শনের সেই বিষণ্ণতা ও বিস্ময়ের ছাপ আছে যা শ্বেতাঙ্গরা নীরক্ত ঔদাসীন্য ও অসাড়তার লক্ষণ ব'লে ধরেন। দারিদ্র্য ও শোকের প্রতি এশিয়াবাসীর নির্মোহ আচরণ যে উদাসীনতা নয় আদপেই, বরং আর্তি যে আসক্তির নাগপাশ, একথা গোপালের পাত্রপাত্রীরা মৌন চোখের ভাষায় বলেন। তাঁদের বিপন্নতার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে জীবনের মোহ।

তাঁর সমসাময়িক ও সঙ্গী নিখিল বিশ্বাস, রবীন মণ্ডল, বিজন চৌধুরী ও প্রকাশ কর্মকারের মতোই যুদ্ধ ও বিভাগোত্তর পৃথিবীতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দুঃখ যন্ত্রণায় কেটেছে তার কাল। তাঁর ছবিতে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা দখল করেছে প্রধান স্থান। ইতিহাস নিয়েছে পুরাণকল্পের আদল, বিচ্ছিন্নতা হয়েছে সকল বোধের উৎস। বস্তুত ভাবাবেগে আপ্লুত না হয়েও রক্তাক্ত হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা ছবির ভাষায় এমন তীব্রভাবে আর কেউ বলেননি। অথচ এই দুঃখবাদ যেন শেষ কথা নয়। নৈরাশ্যের বিবরলোকপ্রাপ্তির পরও জীবনের প্রতি কী আসক্তি তাঁর পাত্রপাত্রীর। নীরন্ধ্র রাত্রির মধ্যে তীব্র তৃষ্ণা। তাঁর ছবির সাবলীল সরল ও বঙ্কিম রেখাগুলি যেন ছন্দে কম্পমান, নিতান্ত ভারতীয় তাদের গতিবিধি। পেছনে থেকে সমতল রঙের নানা আস্তর। জালের মতো তারা যেন ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে আসে ঘোড়া বা খচ্চরের মতো অবলা সব জীব - আর কোথাও থেকে উড়ে আসে অচিন পাখি। বসে এইসব পশুদের পিঠে। আপন মনে নাচে গাছ। অন্যদিকে সব মানুষী, নিপীড়িত, অবজ্ঞাত,, পরাজিত। পাখিরা যেন তাদের আশ্বাস দিতে আসে। গোপালের মনুষ্য মূর্তির অবয়বে হাত পা ও চোখ নেয় বিশেষ অর্থপূর্ণ স্থান। শীর্ণ খড়ি ওঠা হাত - পা। রক্তহীন। আর গভীর দুঃখের আধার ওদের চোখগুলো। স্বপ্নহীন। বোধহয় জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখে। ড্যাব ড্যাব চোখে। মর্মান্তিক এই ছবিগুলো যে দেখেছেসে সহজে ভুলবে না।